Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-I, July 2016, Page No. 1-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে 'নারী-শক্তি'র আধার হিসাবে দশমহাবিদ্যা কাহিনিচিত্রের প্রতিমূর্তির মোটিফ: একটি নিরীক্ষণ

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, এস. ভি. এস. জি. সি. (ইউ. জি. সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড.সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Tantra, worship of Devi-Shakti is referred to as a 'Vidya'. These ten images of 'Sati' are known as Dasha-Mahavidya. The Dasha-Mahavidyas are wisdom Goddesses, aspects of Devi Parvati, who represents a spectrum of feminine divinity, from terrible goddesses at one end to the gentle at the other. This Dasha-Mahavidya is generally familiar as feminine divinity cult, but also exposes the images of 'Subhankari' and 'Bhayankari'. The ten figures of Dash-Mahavidya are: Kali, Tara, Shodoshi, Bhuveneshvari, Bhairavi, Chhinnamasta, Dhumabati, Bagalamukhi, Matangi, Kamala. These Mahavidyas as mythological figures are seen in the terracotta temples of Bengal. Many patterns of images of women are seen on terracotta plaques, from which we get the concept of women power (Nari-Shakti) in spiritual life of Bengal. Moreover, the concept of Nari-shakti has an impact on general women in our society and culture. Our interest is to find out the iconography of 'Dasha-Mahavidya' motif in the terracotta temples of Bengal.

Keywords: Dasha-Mahavidya, Mythology, Terracotta, Temple, Motif, Iconography, Plaque

১. ভূমিকা

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার প্রভৃতি কাহিনিচিত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; তার বিবিধ নিদর্শন আমরা বাংলার বিভিন্ন স্থানের টেরাকোটার মন্দিরগুলিতে দেখতে পাই। ঠিক একই রকমভাবেই পৌরাণিক আখ্যান বা দেবী শক্তির উৎস অথবা Women Power বা 'নারী শক্তি'র আধার হিসাবে স্থান করে নিয়েছিল দশমহাবিদ্যা। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিচিত্রের মতো এতো জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচার লাভ করতে পারেনি এই মহাবিদ্যারা। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে কখনও দেবী শক্তির আধার হিসাবে এই মহাবিদ্যারা শোভা বর্ধন করেছে আবার কখন নারী-শক্তির আধার হিসাবে শিল্পী বা কারিগরেরা মন্দির গাত্রের চিত্রফলকে উপস্থাপিত করেছেন। আবার কোন কোন

মন্দিরে অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে এই মহাবিদ্যাদের আবির্ভাব ঘটেছে। পুরাণ মতে দেবী দুর্গার দশটি রূপ নিয়ে এই দশমহাবিদ্যার আর্বিভাব ঘটেছে। এই দশমহাবিদ্যারা হলেন: কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বগলা ও কমলা। এই মহাবিদ্যারা নিজ নিজ গুণে সমৃদ্ধশালী। শাক্ত মতে বিশ্বাসী মানুষেরা বিশ্বাস করে দেবী দুর্গার এই শক্তিরূপই সর্বোচ্চ মহিমায় উন্নীত এবং এদের সহযোগিতা ছাড়া বাস্তবে কোন কিছুই পরিণতি লাভ করে না। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হল বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে নারী- শক্তির আধার হিসাবে দশমহাবিদ্যা কাহিনিচিত্রের প্রতিমূর্তির মোটিফের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টেরাকোটার মন্দিরগুলিতে আমরা এই দশমহাবিদ্যাদের প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত এই দশমহাবিদ্যাদের চিত্র-ফলকগুলি নারী শক্তিকে উজ্জীবিত তো করেই এর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের শোভা বর্ধনেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই মহাবিদ্যাদের আকার, আকৃতি, ধরণ, গঠন, অলংকরণ প্রভৃতিকে সমকালীন শিল্পী বা কারিগরেরা দর্শকদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছে যে আজ আমরা এই সময়কালেও তার আধ্যাত্মিক এবং নান্দনিক ও শিল্প মূল্যকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। দেবী দুর্গার এই যে ভয়ঙ্করী এবং শুভঙ্করী রূপ দশমহাবিদ্যার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং প্রকাশিত হয় নারী শক্তি জাগরণের কথা। নারী শক্তি যে কতটা ক্ষমতাশালী এবং জগতের সমস্ত কিছুই যে নারী শক্তির দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তা আমরা দশমহাবিদ্যার কাহিনিগুলি পড়লেই বুঝতে পারি।

২. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য:

নদীমাতৃক বাংলায় মাটির সহজলভ্যতার দরুন পাথরের মন্দিরের তুলনায় ইঁটের মন্দির অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই বাংলার ইঁটের মন্দির ও তার অলংকরণ বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় মন্দির-স্থাপত্যগুলি বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র বহন যুগ যুগ ধরে করে নিয়ে চলেছে। বিশেষ করে মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি কাহিনিচিত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের এক অভাবনীয় বিকাশ বাংলায় লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিমবাংলায় তথা বাংলায় রেখা, চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ প্রভৃতি মিশ্র রীতির মন্দির-স্থাপত্য রয়েছে, যা আমাদের দেশীয় কারিগরদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি অতীতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। এখানকার মন্দির-স্থাপত্যগুলিকে মূলত চারটি বর্গে বিভক্ত করা যায়: চালা, রত্ন, দেউল এবং চাঁদনি দালান। চালা রীতির মন্দিরগুলিকে আবার একচালা, দোচালা, চারচালা, জোড়বাংলা প্রভৃতি বর্গে বিভক্ত করা যায়। চালা রীতির মন্দিরের সঙ্গে দেউল ও চাঁদনি রীতির মন্দিরের অনেকটা মিল রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই দুই রীতির মন্দিরের ছাদ সমতল এবং চালা রীতির মন্দিরের ছাদ ঢালু হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাঁদনি ও দালান রীতির মন্দিরের মধ্যে আয়তনেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং এইসব মন্দিরে একাধিক প্রবেশ পথের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রত্ন শৈলী হল বাংলার আর এক প্রকার মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন। চাঁদনি বা দালান রীতির মন্দিরের ছাদে ছোট আকারের চূড়া বা রত্ন বসিয়ে এই রীতির মন্দির তৈরি করা হয়। রত্ন রীতির মন্দির-স্থাপত্যকে আবার একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।

অতএব বাংলায় চালা, রত্ন, দেউল এবং চাঁদনি দালান রীতির মন্দির-স্থাপত্য আমাদের চোখে পড়ে। এই সব রীতির মন্দির-স্থাপত্যগুলি অধিকাংশই ইঁটের তৈরি। আর এই ইঁটের তৈরি মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলি প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে মন্দিরগুলির নান্দনিক ও শিল্প মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, লৌকিক প্রভৃতি কাহিনিচিত্র-ফলক প্রতিস্থাপনের ফলে আমরা এই মন্দিরগুলির দ্বারা তৎকালীন সময়ের ইতিহাস ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি। বাংলার বিভিন্ন রীতির মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জার বিন্যাসে, মন্দিরে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখ ভাগে বাঁকানো কার্নিশের নীচে ও দুই পার্শ্বের সারি

সারি ফ্রেম-বদ্ধ ছোট বড়ো আয়তকার ফলকে এই দশমহাবিদ্যাদের দেখা যায়, যার চারিধার অসাধারণ কারুকার্যমণ্ডিত। বাংলার এইসব রীতির টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলি সম্পূর্ণভাবে ছাঁচে গড়া। মন্দিরগাত্রে এই সমস্ত মূর্তি খচিত টালি বা ফলকগুলি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দির প্রাচীর বা স্তম্ভগাত্রে চুনবালি মিশ্রিত করে পলেস্তারা দ্বারা আঁটকে দেওয়া হতো।

৩. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য ও দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্র

বাংলার টেরাকোটা মন্দিরে নানান পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য-ফলক ছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীরা স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে দশমহাবিদ্যা অন্যতম। এই দশমহাবিদ্যারা কোন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বের ফলকে আবার কোন মন্দিরের মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের দিকে অবস্থিত ফলকগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। আবার কোন কোন মন্দিরে দেখা যায় মন্দিরের একেবারে পার্শ্বের প্যানেলে চৌকোনা খোপে পর পর দশমহাবিদ্যার ফলকগুলিকে। শিল্প, সাহিত্য ও সমাজজীবনে এই দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্তিগুলির প্রভাব ভীষণভাবে পড়েছ। শূধু তাই নয় সমাজজীবনে মানুষের চেতনায় ও কল্পনায় নারী শক্তিকে জাগরিত করে। বাংলার বেশিরভাগ অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে এই দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য:

> " বাঙালি তান্ত্রিকের নিজস্ব কল্পনার ফল দশমহাবিদ্যা। মধ্যযুগেই এই মহাবিদ্যার ধারণা তৈরি হয়। মুন্ডমালা ও চামুন্ডা তন্ত্রে মহাবিদ্যাদের দশাবতার ধারণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু প্রকৃতিরূপে এবং শিব পুরুষরূপে কল্পিত হয়েছেন এখানে, বিষ্ণুরূপে প্রকৃতির দশটি ভেদ তার দশাবতার। যেমন- কালী কৃষ্ণরূপা, তারা রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, ষোড়শী পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, দুর্গা কল্কি।" [১]

তন্ত্রসাধনা বা শক্তিসাধনার উৎস হিসাবে এই দশমহাবিদ্যারা পূজিত হন। তন্ত্র সাধনাতেও এদের যথেষ্ট গুরূত্ব রয়েছে। বিভিন্ন পুরাণেও এই দশমহাবিদ্যাদের উল্লেখ রয়েছে যেমন, দেবী পুরাণ, শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতি। আবার বিষ্ণুপুরাণেও দশাবতারের আলোচনার প্রসঙ্গে দশমহাবিদ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায় বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে মধ্যযুগ থেকেই দশমহাবিদ্যার ধারণাটি এসেছে। বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণে দশমহাবিদ্যা কাহিনিচিত্র মন্দিরের একেবারে সামনের অংশের বিভিন্ন জায়গায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলার যেসব মন্দিরে দশমহাবিদ্যা কাহিনিচিত্র সম্বলিত ফলকগুলি দেখা যায় সেগুলি হল:

১. বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরের পশ্চিমদিকের ত্রিখিলান বারান্দার ভিতরের অংশে দশমহাবিদ্যার দৃশ্য-ফলক রয়েছে।

২. বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরে দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীর ফলক রয়েছে।

৩. বীরভূম জেলার ঘুড়িষার রঘুনাথ মন্দিরে কালী ও ছিন্নমস্তার ফলক রয়েছে।

৪. হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর সাথে কালীকে দেখা যায়।

৫. বীরভূমের ঘুড়িষার লক্ষী-জনার্দনের মন্দিরে কমলেকামিনীর ফলক দেখা যায়।

৬. বীরভূমের ইলামবাজারের রামেশ্বর মন্দিরে কালী, ছিন্নমস্তা ও কমলাকে দেখা যায়।

৭. বর্ধমানের বনকাটির পঞ্চরত্ন মন্দিরের ভিত্তিভূমি সংলগ্ন প্যানেলে রয়েছে- কালী, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, কমলা ও বগলামুখীর
ফলক।

৮. অবিভক্ত বীরভূম জেলার মলুটী গ্রামের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত) বেশ কয়েকটি শিব মন্দিরের সামনের অংশের দুই পার্শ্বের প্যানেলে ও মন্দিরের একেবারে ওপরের অংশে সারিবদ্ধভাবে দশমহাবিদ্যার ফলক রয়েছে।

৯. মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরেও সামনের ও পিছনের অংশে কালী দুর্গা প্রভৃতির চিত্রফলক রয়েছে।

১০. মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার ভট্টবাটির রত্নেশ্বর শিব মন্দিরে কালী ও অন্যান্য দশমহাবিদ্যাদের দেখতে পাওয়া যায়।

১১. পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের লক্ষী-বরোদা মন্দিরেও রয়েছে দশমহাবিদ্যারা।

১২. পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং এর জানকী বল্লভ মন্দিরে এই দশমহাবিদ্যাদের দেখা যায়।

১৩. বর্ধমানের কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরে সামনের অংশে অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে কালীর ফলক দেখা যায়।

১৪. বর্ধমানের কালনার লালজি মন্দিরের সামনের অংশে দশমহাবিদ্যার দৃশ্য-ফলক রয়েছে।

৩.১ দশমহাবিদ্যার কাহিনি: হিন্দুধর্ম হল এমন একটি ধর্ম, যা পরমব্রহ্ম বা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক মাতৃকা শক্তি সম্পর্কে ধারণা জোগায়। হিন্দু ধর্ম অনুসারে শক্তি (নারী) এবং শিব (পুরুষ) এর উপাদানগুলি হল সামগ্রিকভাবে দুটি অংশ, যদিও তারা অসমাপ্ত একে অপরের দ্বারা। 'শক্তি'-- এই অভিধার দ্বারা বর্ণিত হয় তার ক্ষমতা। ভগবান 'শিব' শক্তির সহচর। তাই আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে যে সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির রয়েছে সেখানে দেবতার তুলনায় দেবীদের প্রাধান্যই বেশি।

মহাবিদ্যা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। সংস্কৃতে 'মহা' শব্দের অর্থ মহান এবং 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান, প্রকাশ বা উৎঘাটন। অতএব একত্রে 'মহাবিদ্যা' শব্দের অর্থ হল মহান জ্ঞান উৎঘাটন বা প্রকাশ। দশমহাবিদ্যা হল মহান মাতৃকা শক্তির দশটি দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দু ধর্ম মতে এরা হলেন জ্ঞান বিনাশকারী ও করুণার প্রতিমূর্তি। এই দশটি মহাবিদ্যা একত্রিত হয়ে ইতিহাসে শক্তিতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে (পুরুষ শক্তির থেকে নারী শক্তি যে বেশি ক্ষমতাশালী এই ধারণাটা মানুষের মনে এসেছে দশমহাবিদ্যার ধারণা থেকে)।[২] সুতরাং, এই মাতৃকা শক্তিই হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আর এই মাতৃকা শক্তির বীজ দশমহাবিদ্যার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তন্ত্র সাধনায় এই দশমহাবিদ্যাকে দশটি আলাদা আলাদা নামে প্রকাশ করা হয়। এ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হল:

কালী: কালীকে বলা হয় সময়ের ভক্ষক। কালীর মধ্যে সংহারের রূপ প্রধান। উচ্চশ্রেণির ও ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণদের দ্বারা কালী পূজিত হন।

তারা: তারা এই জগৎকে রক্ষা করে এবং পথপ্রদর্শন করে। কোন বিপদ থেকে উদ্ধারের সর্বশেষ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানও ইনি প্রদান করেন। এই দশমহাবিদ্যায় কালী নীল সরস্বতী নামেও পূজিত হন।

ললিতা-ত্রিপুরাসুন্দরী: এই দেবী ষোড়শী নামেও পরিচিত। ইনি হলেন ত্রিভুবনের সবচেয়ে সুন্দরী দেবী। এই দেবী শ্বেতবর্ণা, পদ্মের ওপর উপবিষ্টা। দেবীর হাতে রয়েছে ব্রহ্ম অক্ষমালা, অভয়মুদ্রা, দণ্ড ও বরদামুদ্রা, তান্ত্রিকদের মত অনুসারে ইনিই সবচেয়ে শক্তিশালী দেবী, যাকে তান্ত্রিকেরা বলে তান্ত্রিক প্রভাতী বা মোক্ষমুকুট।

ভুবনেশ্বরী: ভুবনেশ্বরী হলেন গোটা পৃথিবীর মাতা বা জননী। এই দেবীর গোটা শরীরই হল নিঃস্বর্গ। এই দেবী রক্তবর্ণা, পদ্মাসনের ওপর উপবিষ্টা। দেবীর বাহু ও আয়ুধে রয়েছে পাশ, অঙ্কুশ, অভয়মুদ্রা ও বরদামুদ্রা।

ভৈরবী: ইনি হলেন যুদ্ধের দেবী। এই দেবীও রক্তবর্ণা ও পদ্মাসনে উপবিষ্টা। দেবীর হাতে রয়েছে পাশ, অক্ষমালা, অঙ্কুশ ও বরদামুদ্রা।

ধূমাবতী: ধূমাবতী মৃত্যুর দেবী। এই দেবী ধূম্রবর্ণের এবং কাকধ্বজ রথারূঢ়া। দেবীর বাহু ও আয়ুধে রয়েছে পাশ, অভয়, এবং অঙ্কুশ।

ছিন্নমস্তা: এই দেবী নিজ হস্তে নিজের শিরচ্ছেদ করে নিজের মস্তক ধারণ করে আছেন। দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং দেবীর বাহন কাম ও রতি। এই দেবী নিজ ছিন্নমস্তক নিজ হাতে ধারণ করে এবং নিজ রক্তধারা পান করে।

বগলামুখী: বগলামুখী হলেন শত্রু বিনাশকারী দেবী। এই দেবী বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে শত্রুদের বিনাশ করতে সিদ্ধহস্ত। দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং শবদেহের ওপর উপবিষ্টা। দেবীর বাহু ও আয়ুধে রয়েছে খড়্গ, অভয়, ত্রিশূল ও বরদামুদ্রা।

মাতঙ্গী: এই দেবী হলেন তান্ত্রিক সরস্বতী আবার ললিতার মুখ্য কর্ত্রীও বটে। এই দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং সিংহের ওপর উপবিষ্টা। দেবীর হস্তে রয়েছে শূল, খড়্গ, অক্ষমালা এবং বরদামুদ্রা।

কমলা: কমলা হলেন তান্ত্রিক লক্ষী। দেবী স্বর্ণ-পীতবর্ণের এবং সিংহাসনে স্থিত অষ্টদল পদ্মে দেবী উপবিষ্টা। দেবীর বাহুতে রয়েছে পদ্ম, অভয়মুদ্রা, বিল্মফল ও বরদামুদ্রা।

এই দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী, তারা, ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী- এই চার মহাবিদ্যার পূজা বেশি মাত্রায় প্রচলিত এবং সাহিত্য জগতেও এই চারজনই বেশি মাত্রাই প্রাধাণ্য লাভ করেছে।

৩.২ পুরাণ মতে দশমহাবিদ্যার উৎসকথা: দশমহাবিদ্যার উৎসকথা সম্পর্কে যে পৌরাণিক অনুষঙ্গ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ: পিতা দক্ষরাজের কাছ থেকে কন্যা উমা দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পায় না। তবুও সে পিতৃগৃহে যেতে চায় কিন্তু শিব তাকে যেতে নিষেধ করে। বারংবার চেষ্টা করেও শিব উমাকে আটকাতে অসমর্থ হয়। এই ভেবে শিব ভয় পেতে থাকে যে পিতৃগৃহে উমাকে অসম্মানিত করা হবে। কিন্তু সেই সময় উমা দশদিকে ব্যপ্ত বিনাশকারী ও করুণার প্রতিমূর্তি হিসাবে দশটি ভয়াল রূপ প্রকট করে শিবকে আশ্বস্ত করেন। দশদিকে পরিব্যপ্ত উমার এই দশটি রূপই দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত। [৩]

দশহাবিদ্যার উৎস সম্পর্কিত আরো একটি পৌরাণিক অনুষঙ্গ রয়েছে তা হল- শিব এবং পার্বতী উভয়ে উভয়কে খুবই ভালোবাসত এবং তাঁরা সর্বদা কোন না কোন প্রেমলীলায় মত্ত থাকত। এইরকমই একদিন পার্বতী শিবকে মজার ছলে খুবই উপহাস করছিল, যার ফলে শিব বিরক্ত হয়ে পার্বতীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার হুংকার দেয়। তখন দেবী পার্বতী শিবকে অনুনয় বিনয় করে এবং শিবকে বোঝাতে থাকে তাকে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু শিব তার কোন কথা না শুনে তাকে ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। পার্বতী তখন দশটি দিকে নিজেকে আলাদা আলাদা রূপে পরিব্যাক্ত করে শিবের যাওয়া আটকায়। শিব তখন পার্বতীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। কারণ তিনি যে দিক দিয়ে যেতে চাইছিলেন সেদিকেই পার্বতী কোন না কোন রূপে তাকে আঁটকে দিচ্ছিল। এর মধ্যে দিয়ে শিব বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যে অনন্ত ভালোবাসার গভীরতা এবং নারী শক্তির ক্ষমতাকে। দেবী পার্বতী তার নিজের ক্ষমতা শিবকে প্রদর্শিত করে এবং এর মধ্যে দিয়ে শিবকে অনুভব করান বাস্তবিক অপরিহার্য সত্যতা। [৪]

এই কারণেই দেবীর এই দশটি রূপকে দশমহাবিদ্যা বলা হয়। দশমহাবিদ্যা হল সেই দেবী শক্তি যাঁরা সর্বদা তাঁদের বিপদ গ্রস্ত ভক্তদের সঠিক দিশা প্রদর্শন করে নতুন পথে চলতে সাহায্য করে। নতুন কিছু খোঁজার উদ্দীপনা জোগায় এবং আমাদের চারপাশে বিস্তৃত আধাত্মিকতাকে বুঝতে শেখায়।

উপরের আলোচনার পরিপেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে দেবী দুর্গার এই দশটি রূপই হল দশমহাবিদ্যা, যা মাতৃশক্তি নামেও পরিচিত। দেবীর এই দশ রূপ দশদিকে পরিব্যাপ্ত এবং দশ রূপেও দেবী ভক্তদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করেন। দশমহাবিদ্যার এক একটা রূপ এক একটা বৈশিষ্ট্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। কখনও বা ভক্তবাৎসল কখনও দুষ্টের দমনে সিদ্ধহস্ত। দেবী দুর্গার দশদিকে পরিব্যপ্ত এই দশটি রূপ দেখে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের মনে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল।

৩.৩ দশমহাবিদ্যা ও তাদের বৈশিষ্ট্য: দেবী দুর্গার যে দশটি রূপ তাকেই দশমহাবিদ্যা বলা হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণ মতে দশমহাবিদ্যারা কখনও শুভঙ্করী আবার কখনও বা ভয়ঙ্করী রূপে আর্বিভূত হয়েছেন। কাজেই এঁদের দশটি রূপ-কল্পনা প্রতিফলিত হয়েছে। এবার আমরা নিম্নে পর্যায়ক্রমে এই দশমহাবিদ্যাদের গুণাগুণ, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

৩.৩.১ কালী: কালীকে বলা হয় অনন্ত রাত্রি। কালী সম্পর্কে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে:

"কালী কালী মহা কালী কালীকে পাপ নাশিনী
খড়্গ হস্তে মুক্ত হস্তে কালী কালী নমস্তুতে।"[৫]

হিন্দু ধর্মে কালীকে সবচেয়ে হিংস্র দেবতা বলে মনে করা হয়। কালী শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'কাল' থেকে, যার অর্থ হল সময়। সেই জন্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে কালীকে বলা হয় মৃত্যুর দেবী। বাস্তবে কালী হল মানুষের অহংকারের হত্যাকারী, যারা এই পৃথিবীর ওপর অশুভ ছায়া সৃষ্টি করে সেই সমস্ত অশুভ শক্তিকে কালী ধ্বংস করে। কালী তাঁর ভক্তদের কাছে মা রূপে পূজিত হন।

৩.৩.১.২ শারিরীক গঠনগত বৈশিষ্ট্য: আমরা জানি কালীর চারটি হাত রয়েছে, যাঁর দুটি হাতের মধ্যে একটিতে খড়্গ এবং ওপরটি থাকে সদ্য কাটা মুণ্ড-- যা প্রতিফলিত করে একটি ভয়াভহ যুদ্ধের, যেখানে তিনি ধ্বংস করেছেন দৈত্যদের রক্তবীজকে। অপর দুটি হাতের দ্বারা তিনি ভক্তদের আর্শীবাদ প্রদান করছেন। এছাড়াও মাকালী বাহান্নটি খুলির মালা এবং অস্ত্রের পোশাক পরিধান করে। তাঁর কালো ও নীল গাত্র বর্ণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় যে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি তাঁর থেকেই এবং তাঁর কাছেই এসে সব বিলীন হয়ে যায়। তিনিই হলেন আদি শক্তি।

৩.৩.১.৩ কালী এবং শিব: কালী এবং শিব উভয়েই শ্মশানে বসবাস করে। শ্মশান পরোক্ষভাবে শরীরের অস্থায়ী প্রকৃতিকে বোঝায়, যা আবার স্থায়ীত্বের বিরোধী। ভক্তরা সাধারণত এখানে আসেন তাদের অহংকারের বিনাশ ঘটানোর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে। মা কালী হলেন খুবই দয়ালু। কারণ তিনি তার সন্তানদের মোক্ষ প্রদান করেন এবং উদ্ধার করেন। কালী এবং শিব দুজনেই অশুভ এবং অসত্যকে ধ্বংস করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে স্বার্থপরদের কাছে মা কালী আর্বিভাব হন অত্যন্ত যুদ্ধপরায়ণ রূপে। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষ যারা সত্যিকারের ধর্মপরায়ণ, মা কালী তাদের প্রতি আর্বিভূত হন প্রতিরক্ষা কর্ত্রী, হিতৌষী এবং অনুরক্তা রূপে।

৩.৩.২ তারা: তারা স্বকরুণ দেবী। তারাকে কালীর মতো করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও তাঁদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তারার বর্ণ হল নীল আর কালীর বর্ণ নীল বা কালো দুটোই হতে পারে। তারার চারটি হাত রয়েছে। এক হাতে বাটি ধরে থাকে, যা বৈঠা দ্বারা নির্মিত; একজোড়া কাঁচি জাতিয় অস্ত্র ধারণ করে অপর হস্তে। তৃতীয় হস্তে নীল পদ্ম এবং চতুর্থ হস্তে কুঠার। তারা বাঘের চামড়া দ্বারা সজ্জিত থাকে এবং গলায় থাকে একটি খুলির হার। যদিও তারাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে খুব ভয়াভহ দেবী রূপে। কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি বিবেচিত হন হিতৌষী রূপে এবং সর্বদা তদের আর্শীবাদ প্রদান করেন। তারা হল শিক্ষা-দীক্ষার দেবী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তাদের উন্নতি সাধনের জন্য ঘনঘন তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে। মাতারা সর্বদা তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করেন এবং পরাক্রমের কথা বলেন।

৩.৩.৩ ললিতা-ত্রিপুরাসুন্দরী বা ষোড়শী: ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র তান্ত্রিকদের চক্র পূজা বা যাত্রা পূজাতেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এই দেবী মূলত পূজিত হন শ্রীচক্র যাত্রার সময়। এই চক্র যাত্রার সময় ত্রিপুরাসুন্দরীর সর্বাধিক পূজা করা হয়। ত্রিপুরাসুন্দরীর নামের অর্থ হল ত্রিভুবনের সৌন্দর্য। এই দেবী আবার ললিতা নামেও পরিচিত-- যিনি ইচ্ছা পূরণ করেন। ত্রিপুরাসুন্দরীকে আবার ষোড়শী নামেও ডাকা হয়, যার বর্ণ সিঁদুরে এবং তিনি রাজরাজেশ্বরী অর্থাৎ রাণীদের রাণী, যাকে অতীব সুন্দরী রূপে ধরা হয়।

৩.৩.৩.১ শারিরীক গঠন: ললিতা ত্রিপুরাসুন্দরীকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একজন ষোড়শী যুবতী হিসাবে। তিনি বর্ণিত হয়েছেন বিভিন্ন বর্ণে এবং শিবের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া দেবীকে শ্রীপৃথকের ওপর বসা অবস্থায় দেখানো হয়েছে, যা এক প্রকারের সিংহাসন এবং বেশিরভাগ হিন্দু দেবতারাই এর ওপর বসে থাকেন যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। এই দেবীর শরীর সৃষ্টির গূঢ় ব্যাখা হল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রূদ্র-- এই তিন দেবতার মিলিত শক্তি দ্বারা দেবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রূদ্রাণী।

দেবী ললিতার চারটি হস্ত রয়েছে। এই চার হস্তে দেবী ধরে রয়েছেন: পাঁচটি ফুলের তীর, ফাঁস, অঙ্কুশ এবং ধনুক। দেবী ফাঁসের মাধ্যমে সংযুক্তি প্রদান করেন, অঙ্কুশের মাধ্যমে বোঝায় বিকর্ষণ, ধনুকের মাধ্যমে মন এবং ফুলের তীরের মধ্যে দিয়ে পাঁচটি অর্থের বস্তুকে বোঝায়। দেবী ত্রিপুরেশ্বরী একত্রিত করেন কালীর সংকল্প এবং দুর্গার কবজ, অনুগ্রহ এবং উদ্দিপনার রূপকে। তাঁর কপালে একটি তৃতীয় নেত্র রয়েছে। তিনি লাল বস্ত্র এবং প্রচুর অলংকার পরিধান করে সিংহাসনের ওপর পদ্মাসনে বসে থাকেন। শিব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর হস্তে প্রদান করেন। তাঁর উপস্থিতি সর্বদা একটা রাজকীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

৩.৩.৪ ভুবনেশ্বরী: সংস্কৃত ভাষায় ভুবনেশ্বরী শব্দের অর্থ জগতের সৃষ্টিকত্রী। দেবী ভুবনেশ্বরী হলেন দশমহাবিদ্যার চতুর্থ মহাবিদ্যা। তিনি শারীরিক নিঃস্বর্গকে অনুভব করেন এবং ধারণা করা হয় গোটা জগতের সৃষ্টি ও আকুতি তিনি প্রদান করেছেন। ভুবনেশ্বরীকে দেবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ দেবী হিসাবে ধরা হয়। যিনি এই জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং অপ্রয়োজনীয় মন্দ উপাদান বা বিষয়গুলিকে ধ্বংস করেন। এছাড়াও তিনি কালী, লক্ষী ও সরস্বতী দেবীর মাতা। ভুবনেশ্বরী দেবীর মূল মন্ত্র হল 'হ্রম' এবং তিনি 'ওঁ' শক্তি বা 'আদি' শক্তি নামেও পরিচিত। দেবী ভুবনেশ্বরী হলেন খুবই ক্ষমতাবান দেবী। এই দেবী যদি কিছু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে নবগ্রহও তাঁকে তা থেকে বিরত করতে পারে না।

৩.৩.৫ ছিন্নমস্তা: এই দেবী তাঁর নিজের মস্তক নিজেই ছিন্ন করেন তাই এই দেবীকে ছিন্নমস্তা বা প্রচণ্ড চণ্ডিকা বলা হয়। এই তান্ত্রিক দেবী হলেন অন্যান্য দেবীদের থেকে প্রচণ্ড হিংস্র এবং ভয়ংকর। এই দেবীর মুখবয়াবের মাধ্যমেও তার ভয়ংকরতাকে চিহ্নিত করা যায়। এই দেবী এক হাতে তাঁর নিজ ছিন্নমস্তক ধারণ করেন এবং অপর হস্তে ধারণ করেন খড়্গ। ছিন্নমস্তা ও তাঁর দুইজন সঙ্গিনী মিলে রক্ত প্রবাহের ধারা পান করছে। এই দুইজন সঙ্গিনী ছিন্নমস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়াও ছিন্নমস্তাকে কল্পনা করা হয়েছে যে তিনি দুইজন রতি সঙ্গমরত মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুইজন মানুষ হলেন কামদেব এবং রতি।

ছিন্নমস্তার এই চিত্র দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এই মহাবিদ্যা হলেন স্বত্যাগী এবং এই দেবীর মধ্য দিয়ে কুণ্ডলীনি জাগরণের ধারণাও জন্মায়, যা শরীরের মধ্যেকার সুপ্ত অবস্থায় থাকা আধ্যাত্মিক শক্তিকে বোঝায়। চিন্নমস্তা হলেন এক অসঙ্গতির মিশ্রণ। এই দেবীকে কল্পনা করা হয় যৌন শক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে, যা কিনা নির্ভর করে ভক্তদের নিজ নিজ ইচ্ছার ওপর। যেহেতু ছিন্নমস্তাকে ধরা হয় তিনি অন্ধকার ও ভয়ংকর দেবী, তাই এই দেবীর পূজা খুব অল্প সংখ্যক মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পূজা প্রধাণত তন্ত্র সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সাধনা মূলত তান্ত্রিক ও যোগীরা করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছিন্নমস্তা হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধদের কাছেও সমানভাবে গৃহীত। তিব্বতীয় বৌদ্ধদের দেবী ব্রজযোগীনির ছিন্নমস্তক রূপ 'ছিন্নমুণ্ডার' সাথে এই দেবীর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

৩.৩.৫.১ শারীরিক বৈশিষ্ট্য: ছিন্নমস্তাকে দেখানো হয়েছে জবা ফুলের মতো লাল বর্ণের এবং লক্ষাধিক সূর্যের মতো উজ্জ্বল রূপে। দেবীর চিত্র ও মূর্তিগুলি বেশিরভাগই উলঙ্গ, চুলগুলি অপরিছন্ন। ছিন্নমস্তাকে সম্পূর্ণ স্তন বিশিষ্ট একজন ষোল বছর বয়সী যুবতী হিসাবে ধরা হয়, যার হৃদয়ের কাছে থাকে নীল পদ্ম। ছিন্নমস্তাকে একটি সর্পিল আকার পবিত্র সূতো দ্বারা সাজানো হয়েছে এবং ছিন্নমস্ত বা খুলির মালা পরে রয়েছে এই দেবী। এছাড়া অস্থি ও অন্যান্য অলংকারও তাঁর শরীরে থাকে।

তিনি তাঁর বামহস্তে নিজ ছিন্নমস্তক ধারণ করেন এবং ডান হস্তে ধারণ করেন খড়্গ জাতীয় অস্ত্র, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে মস্তকহীন করেছেন। তিনটি রক্তের ধারা তাঁর ঘাড় থেকে বেরিয়ে আসছে, যার মধ্যে একটি তাঁর নিজেরই কাটা মুণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং ওপর দুটি রক্তের ধারা তাঁর সঙ্গিনীরা পান করছে। তাঁর দুজন সঙ্গিনীকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উলঙ্গ রূপে, যাদের তিনটি নেত্র রয়েছে। তাঁরা ধারণ করে আছে সর্পিল পবিত্র সূতো এবং তাদের ডান হস্তে রয়েছে খুলির বাটি এবং বাম হস্তে রয়েছে ছুরি।

৩.৩.৫.২ ছিন্নমস্তার উৎসকথা: ছিন্নমস্তার জন্মের কয়েকটি কাহিনি পাওয়া যায়। প্রথম কাহিনি সম্পর্কে জানা যায় যে, পার্বতী যখন মন্দাকিনী নদীতে স্নান করছিলেন তখন তিনি যৌন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর গাত্র বর্ণকে কালো বর্ণে পরিবর্তন করেন। সেই সময় তাঁর দুইজন সঙ্গিনী ডাকিনী এবং যোগিনীর প্রচণ্ড খিদে পায় এবং তাঁরা দেবীর কাছে খাদ্য প্রার্থনা করতে থাকে। যদিও পার্বতী তাদের আগেই কথা দিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ি ফিরেই খেতে দেবেন। কিন্তু পরিস্থিতি এই রকম হওয়ায় তিনি তাঁর নখের দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করেন এবং ঘাড় থেকে নির্গত রক্তের ধারা তাঁর সঙ্গিনীদের পান করিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করান।
ছিন্নমস্তার জন্মের আর একটি কাহিনি হল কিভাবে দেবী প্রচণ্ড চণ্ডিকা বিপদের সময় দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন সমস্ত অশুভ দৈত্যদের হত্যা করে। এরপর দেবী উন্মাদ হয়ে নিজের মস্তক ছেদন করেন এবং নিজেই নিজের রক্ত পান করেন।

সমুদ্র মন্থনের সময়েও এই দেবীর নাম সামনে আসে। সমুদ্র মন্থনের পর ছিন্নমস্তা দৈত্যদের ভাগের অমৃত পান করেন এবং তার পরেই নিজের মস্তক নিজেই ছিন্ন করেন দৈত্যদের সেই অমৃত পান করা থেকে আটকানোর জন্য।

৩.৩.৫.৩ ছিন্নমস্তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রতীক: এই দেবী বোঝায় যে জন্ম, মৃত্যু এবং যৌন ক্রীয়া হল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর নিজের চিত্রের দ্বারা ছিন্নমস্তা প্রকাশ করে যে অনন্ত সত্যের দ্বারাই জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং সেইজন্যই যৌনক্রিয়ার অন্তিম উদ্যেশ্য হল আরো বেশি জীবনের চিরস্থায়ীত্ব করা। পদ্ম এবং সঙ্গমরত যুগল (নর ও নারী) হল জীবন এবং জন্মদানের তাড়নের প্রতীক। দেবীর ঘাড় থেকে যে রক্তধারা বইছে তার অর্থ মৃত্যুকে বোঝায়, যা তার ভক্তদের মুখে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলত হয় যে তিনি একজন দানশীলা দেবী।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ছিন্নমস্তার ছবি কুণ্ডলীনি জাগরণের উপস্থাপনা করে। মিলনরত দম্পতি আসলে উপস্থাপনা করছে মূল ধারা চক্রের জাগরণকে। কুণ্ডলীনি শরীরের মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে যায়। দেবীর গলা থেকে যে রক্ত ঝরে চলেছে তার ঊর্দ্ধমুখী কুণ্ডলীনির প্রবাহকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। ডাকিনী, যোগিনী এবং ছিন্নমস্তাকে তিনটি সূক্ষ নাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেগুলি হল ইরা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। নিজ হত্যার মধ্যে দিয়ে অহংকারের পতনকে প্রতিফলিত করেছে এই দেবী।

৩.৩.৬ ভৈরবী: দেবী ভৈরবী ভয়ংকর এক দেবী। তিনি আবার ভগবান ভৈরবেরও স্ত্রী। এছাড়া এই দেবী হলেন শিবের মাতা। এই দেবী ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। এইজন্য এই দেবীকে ক্ষয়ের দেবীও বলা হয়। কিন্তু ভৈরবীর ধ্বংসলীলা সর্বদা নেতীবাচক দিককে ইঙ্গিত করে না। তাঁর ধ্বংসের পেছনে মূল কারণ হল সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা ধ্বংস হওয়ার মধ্যে দিয়ে জীবনচক্রকে সচল রাখা।

৩.৩.৬.১ শারীরিক গঠনগত গুণাবলী: দেবী ভৈরবীর সঙ্গে ভয়ানক কালীর অনেকাংশে মিল রয়েছে। তাঁরা দেখতে অনেকটা একই রকম। তাঁদের শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক; শুধুমাত্র ভৈরবীকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভৈরবের স্ত্রী রূপে। ভৈরবী হলেন এমন দেবী যে ভালো মানুষের জন্য অতিব ভালো এবং খারাপদের জন্য অতিব ভয়ংকর। যখন দেবী ভৈরবী রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর ভয়ংকর উপস্থিতি দৈত্যকুলকে দুর্বল করে তুলেছিল। বেশিরভাগ দৈত্যই তাঁর এই ভয়ংকরতার কাছে হার মানে।

ভৈরবী যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদের হত্যা করে তখন ভৈরবীকে মহাকালী রূপে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও তিনি চন্দ এবং মুণ্ড নামক অশুরকে হত্যা করে তাদের রক্ত পান করেছে। এই জন্যই এই দেবীকে বলা হয় চামুণ্ডেশ্বরী। ভৈরবীকে দুর্গা রূপেও চিহ্নিত করা যায়। এই হিংস্র রূপ নিয়ে দেবী কখনও কখনও গাধার ওপর বসে থাকেন। তাঁর শরীরে মোড়া রয়েছে বাঘের চামড়া ও হাড় এবং তা থেকে থেকে ক্ষরণ হচ্ছে অসুরদের রক্ত। তিনি

অভয়মুদ্রা এবং ভাঙ্গামুদ্রায় বসে থাকেন। এছাড়াও তাঁকে অনেক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থাতেও দেখা যায়, যেমন- খড়্গ, তলোয়ার, বজ্র ইত্যাদি।

দেবী ভৈরবীকে মহা প্রলয়ের সাথেও তুলনা করা হয়, যার মধ্যে দিয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টিই একসময় না একসময় ধ্বংস হয় সেহেতু ধ্বংসের অস্তিত্ব রয়েছে সর্বত্রই। এর থেকে এই কথা বলা যায় যে দেবী ভৈরবীর অস্তিত্বও রয়েছে সর্বত্রই।

৩.৩.৭ ধূমাবতী: ধূমাবতী নামের আক্ষরিক অর্থ 'ধোঁয়ায় যার জন্ম'। এই দেবীর রূপ-কল্পনায় ভয়ংকর এক বৃদ্ধা বিধবার রূপ লক্ষিত হয়। তাঁকে যে রকমভাবে চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে তার অর্থ হল যে তিনি হলেন অশুভ এবং অনাকষর্ণীয়। এটা মনে করা হয় যে ধূমাবতী নিজেকে উদ্ভাসিত করেছেন মহাপ্রলয়ের সময় একজন মহান দেবী হিসাবে, যা সৃষ্টির আগে এবং পরে বিদ্যমান। ধূমাবতী অলক্ষণের দেবী হিসাবে বিবেচিত হয়। তার সহস্র নামের স্তবগানের মধ্যে দিয়ে তাঁর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এছাড়াও বলা হয় যে তিনি হলেন কোমল হৃদয়ের এবং ভক্তদের আর্শীবাদ প্রদানের মাধ্যমে সবকিছু প্রদান করেন। ধূমাবতী হলেন একজন মহান শিক্ষিকা যিনি জগতের চূড়ান্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করেন। তাঁর অরূপ আকৃতির মধ্য দিয়ে ভক্তদেরকে অভ্যন্তরীণ সত্য বোঝানোর চেষ্টা করেন।

এছাড়াও ধূমাবতী ভক্তদের কাছে সিদ্ধিবাদী ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী রূপেও পরিচিত। যিনি তার ভক্তদের সমস্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন এবং মোক্ষ প্রদান করেন। যে সব মানুষেরা তাদের শত্রুদের দমন করতে ইচ্ছুক তারা খুব ভক্তি সহকারে দেবী ধূমাবতীর পূজা করে। আবার অন্যদিকে যারা জীবনসাথী খুঁজছে দেবী ধূমাবতী তাদের দ্বারাও পূজিত হন। যেসব তান্ত্রিকেরা 'অতিপ্রাকৃত শক্তি'র ক্ষমতা (Supernatural Power) পেতে চায় ও ইহ জগতের সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতে চায় তাদের দ্বারাও ধূমাবতী পূজিত হন। বারাণসীতে দেবী ধূমাবতী তাঁর সব অশুভ ক্ষমতাকে পরিত্যাগ করে একজন স্থানীয় রক্ষাকারী দেবী রূপে পূজিত হন। ভারতবর্ষের খুব অল্প সংখ্যক মন্দিরেই দেবী ধূমাবতীর পূজা করা হয়। তান্ত্রিকেরা এই দেবীর পূজা এবং সাধনা করেন নির্জন স্থানগুলিতে, এর মধ্যে শশ্মান এবং জঙ্গল অন্যতম।

ধূমাবতী হলেন কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, ধ্বংস, মৃত্যু এবং হতাশার দেবী। যিনি দুর্বলতা এবং দুর্বিপাকের ভগবান। এই দেবী অত্যন্ত বদমেজাজী এবং অখুশীর আবহাওয়া বা পরিবেশকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বিবাদ বিতর্কের সৃষ্টি করেন।

৩.৩.৭.১ শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য: তন্ত্র সাধকের কাছে ধূমাবতী একজন বৃদ্ধা, রোগা এবং কুৎসিত বিধবা দেবী রূপে বিবেচিত হয়। দেবীর গাত্র বর্ণ ফ্যাকাসে। তিনি চিত্রাঙ্কিত হয়েছেন দুর্বল এবং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রূপে। তিনি পরিধান করেন পুরানো এবং নোংরা কাপড়। দেবীর গায়ে কোন গহনা থাকে না এবং চুলগুলি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। তাঁর চোখ উদ্দিপিত করে ভয়কে, তাঁর নাক হল লম্বা এবং কুটিল এবং তাঁর লম্বা দাঁতগুলি মাঝে মাঝে ফাঁকা, যা তাঁর হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। তাঁর কানগুলি হল অপরিচ্ছন্ন ও রূক্ষ এবং তাঁর স্তনগুলি নিটোল নয়।

ধূমাবতীর একটি কম্পিত হস্তে থাকে কুলা এবং অপর হস্তে থাকে মুদ্রা। তাঁর বাহন হল ঘোড়া বিহীন রথ, যার মধ্যে কাকের চিত্র যুক্ত পতাকা দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় এই দেবীকে দেখানো হয়েছে ত্রিশূল হস্তে। আবার কোথাও কোথাও এই ভয়াবহ দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই দৈত্যের মৃতদেহ খাচ্ছেন এবং তাদের রক্ত ও সুরা পান করছেন। আবার কোন কোন দুর্লভ ছবিতে এই দেবীকে দেখানো হয়েছে যে তিনি একজন সুন্দরী এবং যুবতী মহিলা যাঁর সম্পূর্ণ স্তন রয়েছে এবং দেবীর সারা শরীর সোনার গহনা দ্বারা অলংকৃত রয়েছে। কোন কোন স্থানে এই দেবীকে যৌন প্রলুব্ধকারী দেবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে এই দেবী হলেন একজন অশুভ বিধবা। নেপালের কিছু জায়গার মন্দিরে তাঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একজন উলঙ্গ মহিলা দেবী রূপে। যিনি পরিধান করে

আছেন মুক্তার হার ও মাথায় রয়েছে ফিতে। দাঁড়িয়ে আছেন ময়ূরের ওপর এবং তাকিয়ে আছে একটি আয়নার দিকে যেখানে তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। দেবীকে ঘিরে রয়েছে কিছু আগুনের শিখা যা সম্ভবত শবদাহের আগুন।

৩.৩.৭.২ ধূমাবতীর উৎসকথা: দেবী ধূমাবতী এই জগতের দক্ষিণদিক পাহারা দেয়। 'শাক্তসমাগম তন্ত্র' অনুসারে সতী যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন সেই আগুন থেকেই ধূমাবতীর উৎপত্তি। অপর একটি জায়গায় বলা হয়েছে: একদা সতী খুব ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন এবং শিবকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে কিছু খাদ্য দেওয়ার জন্য। শিব খাদ্য দিতে অসমর্থ হওয়ায় সতী রেগে গিয়ে শিবকে গিলে খেয়ে নেয় এবং তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করেন। শিব পেট থেকে তাকে উদ্গীর্ণ (উগলে) করে দেওয়ার অনুরোধ করে কিন্তু এই অনুরোধ সতী অস্বীকার করে। এরপর শিব খুব ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় যে এই ত্রিভুবন তাঁকে বিধবা রূপে গণ্য করবে। তবে মজার ব্যাপার এই যে দেবী ধূমাবতী যৌন ক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং বলা হয় যে যেখানে যৌন কার্যকলাপ চলে সেখানেই ধূমাবতী আর্বিভূত হন। তিনি মদ্য পান করে মত্ত অবস্থায় থাকতে ভালোবাসেন এবং এই দেবী মূলত পূজিত হন মর্ত্য মানবের দ্বারা।

৩.৩.৮ বগলামুখী: দেবী বগলামুখী হলেন এমন একজন দেবী যিনি তাঁর ভক্তের শত্রুদের বিনাশ বা ধ্বংস করেন। উত্তরভারতে তিনি পীতাম্বর এবং ব্রহ্মাস্থ-রূপিনী নামেও পরিচিত। তিনি হলেন এমন একজন দেবী যিনি তাঁর মুখমণ্ডলীর ক্ষমতা দ্বারা কাউকে আয়ত্তে আনতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও প্রয়োজনে এই দেবী সম্মোহনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে।

৩.৩.৮.১ শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য: বগলামুখী উজ্জ্বল সোনালী বর্ণের এবং হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করে থাকেন। এই দেবী সোনার সিংহাসনে বসে থাকেন। এই সিংহাসনটি অমৃত সাগরের মাঝখানে অবস্থিত, যা আবৃত থাকে হলুদ রঙের পদ্মের দ্বারা। একটি হেলানো চাঁদ তাঁর মাথাকে অলংকৃত করে রাখে। তাঁকে কখনও দ্বিভূজা আবার কখনও চতুর্ভুজা রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আবার অন্য এক রূপে এই দেবীকে দেখানো হয়েছে যে তাঁর ডান হাতে রয়েছে একটি গদা এবং সেই গদা দিয়ে এক দৈত্যকে প্রহার করেছেন এবং বাম হাতের দ্বারা সেই দৈত্যের জিহ্বা টেনে বের করে আনছেন। দেবীর এই রূপের মধ্যে দিয়ে মর্ত্য মানবেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেবী তাঁর এই রূপের মধ্যে দিয়ে ভক্তদের নিশ্চুপ করিয়ে দেয়। তিনি পরিচিত ক্ষমতারূপী দেবী হিসাবে যিনি যে কোন কিছুকেই তার বিপরীত অবস্থায় পরিবর্তিত করতে পারে, যেমন কথাবলাকে নিশ্চুপ করা, জ্ঞানীকে অজ্ঞতা, পরাজয়কে বিজয় ইত্যাদি।

৩.৩.৮.২ বগলামুখীর উৎসকথা: দেবতারা বিশ্বাস করতো যে এই পৃথিবীতে একসময় বিশাল প্রলয় আসবে। সেই প্রলয়ের এমনই ক্ষমতা থাকবে যে সেই প্রলয় গোটা পৃথিবীকেই ধ্বংস করার হুমকি দেবে। এই ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমস্ত দেবতারা সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে একত্রিত হয়ে দেবী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাদের এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে। দেবী বগলামুখী তখন হরিদ্র সরোবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অন্যান্য দেবতাদের প্রার্থনায় খুশি হয়ে এই পৃথিবীতে নেমে এসে এই প্রলয়কে শান্ত করেন।

৩.৩.৮.৩ বগলামুখীর পূজা পদ্ধতি: হিমাচলপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ বগলামুখীর অনেক মন্দির দেখা যায়। নেপালেও বগলামুখী পূজিত হন। বগলামুখীর পূজা করা হয় বৈদিক নিয়মনীতি অনুযায়ী যা শুধুমাত্র, অভিজ্ঞ পূজারিই করতে পারেন। বগলামুখীকে তাঁর ভক্তরা পূজা করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে তাদের শত্রুদের ক্ষমতা কমে যায় এবং শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে।

৩.৩.৯ মাতঙ্গী: মাতঙ্গী হল দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ। যেখানে দেবী সরস্বতীর শক্তি নির্দেশিত হয় শিক্ষা, ভাষা এবং কলার প্রতি। আর ওপর দিকে মাতঙ্গীর শক্তি নির্দেশিত হয় মূলত অভ্যন্তরের দিকে গভীর জ্ঞান ধারণের মধ্যে

দিয়ে। মতঙ্গী হলেন অভ্যন্তরীণ ভাবনা চিন্তার রক্ষা কত্রী। তিনি তাঁর ভক্তদের তত্ত্বাবধান করেন আদিম শব্দ 'ওম' শিখতে। ঋষি মাতঙ্গের কন্যা হল দেবী মাতঙ্গী। তিনি তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে দেবী মীনাক্ষী রূপেও পূজিত হন। মাতঙ্গী হল সতীর অন্য এক রূপ। এই মহাবিদ্যা বগলামুখীর পরেই অবস্থান করে। মাতঙ্গীর সঙ্গে পূর্ণিমার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।

৩.৩.৯.১ শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য: মাতঙ্গী ত্রিনয়ন বিশিষ্ট্য। তাঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নীল-কালো রঙের বর্ণে, অত্যন্ত সুন্দরী রূপে, বিশাল বক্ষ বিশিষ্ট্য ও সরু লম্বা কোমর এবং সুসজ্জিত কেশরূপে। তিনি ধারণ করে আছেন একটি অঙ্কুশ, খড়্গ, ঢাল এবং সরোদ। এক এক অঞ্চলে এই দেবীর হাতে এক এক উপাদান দেখা যায়।
দেবী মাতঙ্গী এক নিম্ন বর্ণের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর বাবা ছিলেন একজন চণ্ডাল। আর সেই কারণেই মাতঙ্গী নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা পূজিত হন। দেবী মাতঙ্গী তাঁর ক্ষমতার দরুন অনেক রূপ ধরতে পারেন এবং তিনি শক্তিশালী ক্ষমতার সাথে যুক্ত। মহাবিদ্যার অংশ রূপে দেবী মতঙ্গী হলেন একজন সম্পূর্ণ শক্তি এবং এই দেবীকে একজন শক্তিশালী পবিত্র নারী রূপে গণ্য করা হয়।

৩.৩.১০ কমলা: কমলাকে দেবী লক্ষীর তান্ত্রিক রূপের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়, যিনি সম্পদের দেবী। কমলা হলেন সৃষ্টি এবং চেতনার দেবী। স্বর্ণবর্ণের অদ্ভুদ সুন্দর এই দেবীকে দেখা যায় একটি সম্পূর্ণ স্পফুটিত পদ্মের ওপর বসা অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দেবীর দুই পাশে দুটি হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। কমলার প্রধান শক্তি হল দারিদ্র্যকে ধ্বংস করা। উপাদানিক ও আধ্যাত্মিক-- এই দুটি দিক এবং কল্যাণ, সমৃদ্ধি, উর্বরতার দাত্রী হিসাবেও তিনি পরিচিত। বাস্তবে লক্ষী এবং কমলা দুজন একই দেবী। যদিও কমলার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক খুব গূঢ়।

৩.৩.১০.১ আধ্যাত্মিকতায় পদ্মের উপস্থিতি: আধ্যাত্মিকভাবে পদ্মের মাধ্যমে বোঝায় শুদ্ধতা, প্রকৃষ্টতা এবং ভক্তিকে। এছাড়াও পদ্ম সমগ্র উদ্ভাসিত বিশ্বের প্রতীক, যা খুঁজে পাওয়া যায় প্রত্যেক যন্ত্রে এবং হিন্দু মন্দিরের বহু ভগবানের সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এছাড়াও পদ্মের গূঢ় তাৎপর্য হল এই যে এটি মূলত বৃদ্ধি পায় কাদা এবং ঘোলাটে জলে। এটি বড়ো বড়ো পাতার মাঝে চমৎকারভাবে বিস্ফোরিত হয়ে থাকে, যার পাঁপড়িগুলি থেকে সুন্দর সুন্দর গন্ধ ছড়ায়। এর দ্বারা শরীরের মধ্য থেকে শুদ্ধ সীমাহীন আত্মার উত্থানের প্রতীক পাওয়া যায় । এই সুন্দর ফুলটির প্রায় সমস্ত অংশই ভোজ্য এবং স্বাস্থ্যকর।

কমলার দুইপাশে অবস্থিত হাতিদ্বয়ের শুঁড় দ্বারা যে জলধারা নির্গত হয় তা হল বর্ষাকালের বৃষ্টির প্রতীক, যার দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কমলা হলেন জগৎ পালক ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী। তথাপি তিনি গোটা পৃথিবীর পালিকা। যদিও বেশিরভাগ চিত্রে লক্ষীকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তিনি ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেছেন আবার কোথাও কোথাও দেখানো হয়েছে দুটি হাতি তাদের শুঁড়ের সাহায্যে দেবী কমলাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

৩.৩.১০.২ সৃজনশীল দেবী কমলা: কমলা হল সেই শক্তি যা সর্বত্র খুশি এবং আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। কমলা সন্তান-সন্ততি সহ পরিবারকেও আর্শীবাদ প্রদান করেন। যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সন্তান হীনতায় ভোগেন তাঁরাও এই তান্ত্রিক দেবী কমলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করেন। আবার যাদের সন্তান বর্তমান তারাও তাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্য দেবী কমলার পূজা করেন ।

৪. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে দশমহাবিদ্যার ফলকের আকার, অবস্থান, নক্শা, বিন্যাস, মূর্তির ধরণ ও গঠন এবং বর্তমান অবস্থার পরিচয়: বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্রের ফলক প্রতিস্থাপনের যে আলাদা গুরূত্ব ও মাত্রা রয়েছে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই মহাবিদ্যাদের ফলকগুলি কেবলমাত্র আধাত্ম্য চিন্তা-ভাবনা বা নারীশক্তিকেই উজ্জীবিত করে না, মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধনেও এই ফলকগুলির বিন্যাসের যথেষ্ট শিল্পগত ও নান্দনিক গুরূত্ব রয়েছে। দশমহাবিদ্যার ফলকের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হয় ৭ ইঞ্চি মতো। মন্দির-গাত্রে লম্বাটে চৌকোনা ফলকে এই দশমহাবিদ্যারা অবস্থান করে। মুর্শিদাবাদের বড়নগর

বা বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই মন্দিরে Bas Relief-এ ফলকগুলি প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। বর্ধমানের অম্বিকা-কালনা, ঝাড়খণ্ডের মলুটী, বীরভূমের ঘুড়িষা প্রভৃতি স্থানের টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে সাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বের খাড়াখাড়িভাবে লম্বা প্যানেলে এক একটা ফলকে এক একটা মহাবিদ্যাকে দেখা যায়। আবার মন্দিরের পার্শ্বের প্যানেল বা মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগের ঠিক ওপরের অংশে আড়াআড়িভাবে অর্ধবৃত্তাকারে তিনটে বা চারটে ফলকে মহাবিদ্যাদের প্রতিস্থাপিত হতে দেখা যায় *(চিত্র নং-১, ২ ও ৩)*।

চিত্র নং-১ মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বের খাড়াখাড়িভাবে লম্বা প্যানেলে দশমহাবিদ্যার অবস্থান।

চিত্র নং-২ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের অর্ধাবৃত্তাকার প্যানেলে দশমহাবিদ্যার অবস্থান।

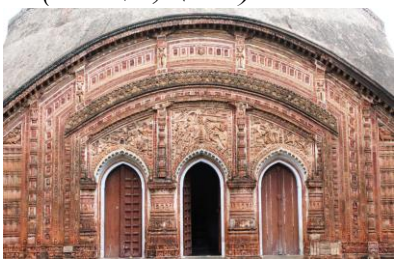

চিত্র নং-৩ মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বের খাড়াখাড়িভাবে লম্বা প্যানেলে ও উপরের অর্ধাবৃত্তাকার প্যানেলে দশমহাবিদ্যার অবস্থান।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে দশমহাবিদ্যার ফলকগুলির অবস্থান সম্পর্কে বলা যায়, মন্দিরের প্রবেশের সম্মুখভাগের দুই পার্শ্বের প্যানেলে সাধারণত এই মহাবিদ্যাদের ফলকের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, হুগলির বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেব মন্দির, বীরভূমের ইলামবাজারের রামেশ্বর মন্দির, মুর্শিদাবাদের ভট্টবাটির রত্নেশ্বর শিব মন্দির, অম্বিকা-কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে দশমহাবিদ্যাদের একসাথে দেখা না গেলেও পৃথক পৃথকভাবে দেখা যায়। যেমন কোন কোন স্থানে মন্দিরের একেবারে সম্মুখভাগে রাম-রাবণের সম্মুখ সমরের মাঝখানে দেবী দুর্গাকে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগের একেবারে ওপরের অংশে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাঝে এই দশমহাবিদ্যাদের কাউকে কাউকে দেখা যায় যেমন- কালী, তারা, কমলা, বগলা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি *(চিত্র নং-৪-৯)*। । কোথাও আবার পার্শ্বের প্যানেল বা পেছনের অংশের সমাজচিত্রের ফলকের মাঝে দেখানো হয়েছে কোন এক রমণী বা ভক্ত কালী মাকে পূজা করেছে।

চিত্র নং-৪ টেরাকোটা ফলকে কালীর প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-৫ টেরাকোটা ফলকে কালীর প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-৬ টেরাকোটা ফলকে তারার প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-৭ টেরাকোটা ফলকে কমলার প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-৮টেরাকোটা ফলকে ছিন্নমস্তার প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-৯টেরাকোটা ফলকে মাতঙ্গীর প্রতিমূর্তি

এবার আসা যাক দশমহাবিদ্যার মূর্তির ধরণ ও গঠন প্রসঙ্গে। বাংলার টেরাকোটা মন্দির গাত্রে দশমহাবিদ্যার ফলকগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপিত করেছে তৎকালীন শিল্পী-কারিগরেরা যে তার আকৃতিসমূহ ও শিল্প-রীতির প্রতিফলন দেখে মনে হয় এই মহাবিদ্যারা জীবন্ত রূপে অবস্থান করে আছে মন্দির গাত্রে। এইসব শিল্পী-কারিগরেরা যে যে অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ করতে গেছেন সেই অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্যের ফলকে সেই অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। অর্থাৎ এগুলির আঞ্চলিক রূপ দেখা যায়। কাজেই বাংলার এক এক অঞ্চলের মন্দিরে এই দশমহাবিদ্যাদের আকৃতি ও গঠন এক এক রকম। বেশ-ভূষা, অলংকার, মূর্তির গঠন সবেতেই এই পার্থক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এঁদের প্রতিটি মূর্তি ফলকের নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি এই ফলকগুলিকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে প্রতিটি ফলকের শ্রেণিবিন্যাসগত দিক থেকে যে সংযোগসূত্র রয়েছে তা পরিলক্ষিত করতে পারব। মন্দিরের ভিত্তিভূমি থেকে একটু ওপরের দিকে নতোন্নত বা Bas Relief-এ দশমহাবিদ্যাদের ভাস্কর্যগুলির উপস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছে যে যা দেখে মনে হয় এগুলি শুধুমাত্র ফলক নয়, মূল মন্দির প্রবেশের পূর্বেই ভক্তরা দেবী দুর্গার এই মহান রূপকে দর্শন করে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। দশমহাবিদ্যার এই ভাস্কর্যগুলি কখনও ভিত্তিগাত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আবার কখনও ভিত্তিগাত্রের সাথে লেগে রয়েছে। মন্দির-গাত্রের ভাস্কর্যে দশমহাবিদ্যার এই শুভঙ্করী ও ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যে দিয়ে গতিময়তা, ভক্তবাৎসল্যতা, রুদ্র ও ক্ষিপ্ত রূপ এবং জগৎ জননী রূপের ভাব ও ভঙ্গিমা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। দশমহাবিদ্যার এই নতোন্নত ভাস্কর্যগুলির মোটিফ কারিগরদের মানস-কল্পনা ও দক্ষতা এবং ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের নান্দনিক সৌকর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে মন্দিরগুলির প্রাসঙ্গিকতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সমউচ্চতা বিশিষ্ট দশমহাবিদ্যার সমন্তরাল ও শ্রেণীবদ্ধ মূর্তির প্যানেলগুলি পৌরাণিক আখ্যানযুক্ত এবং শিল্পকৃতির দিক থেকে যথেষ্ট সাবলীল ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত। এদের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা, ছন্দোময়তা ও গতিময়তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। পরপর এই দশমহাবিদ্যাদের দশটি রূপ দেখে দর্শকদের চক্ষু যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেই জন্য প্রতিটি ফলকের চারপাশ জ্যামিতিক নক্শা, উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক নক্শার মোটিফ দিয়ে দর্শকদের চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে সমকালীন শিল্পী বা কারিগরা। আর এর সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিকতার দিকটিও পরিস্কার ও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব মহাবিদ্যাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, দেহের গঠন, অলংকার, হাত, পা, চোখ, মুখ প্রভৃতি একেবারে নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন শিল্পীরা।

চৌকোনা আকারের ফলকগুলিতে দশমহাবিদ্যার যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার চারধারে মূলত উদ্ভিদজগৎ কেন্দ্রিক ও জ্যামিতিক নক্শার অসাধারণভাবে সীমারেখা দেওয়া হয়েছে। ফলকগুলির বাইরের দিকে দুপাশ দিয়ে রৈখিক আকারে কোন জায়গায় তিনটে লাইন বিশিষ্ট ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নক্শার মোটিফ দেখা যায়। আবার দেওয়াল গাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকের ভেতরেও দশমহাবিদ্যার মূর্তির চারধারেও উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক নক্শা ও জ্যামিতিক নক্শার মোটিফ দেখা যায়। আর যে ভিত্তিভুমির ওপর (Platform) এর ওপর মূর্তিগুলি দাঁড়িয়ে থাকে তার নীচেও পদ্মের ফুলের পাঁপড়ির মোটিফ দেখা যায় *(চিত্র নং-১০ ও ১১)*।

চিত্র নং-১০ টেরাকোটা ফলকে সিংহাসনের উপর কালীর প্রতিমূর্তি

চিত্র নং-১১ টেরাকোটা ফলকে সিংহাসনের উপর পদ্মে উপবিষ্ট কমলার প্রতিমূর্তি

বাংলার বেশিরভাগ মন্দিরেই সাধারণত মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগের পার্শ্বের ফলকগুলিতে বা ওপরের ফলকে এই দশমহাবিদ্যাদের দেখা যায়, যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই আমরা দেখতে পাই মন্দিরের সম্মুখভাগের দুই পার্শ্বে লম্বা আকারের সারিবদ্ধ প্যানেলে এক পার্শ্বে রয়েছে দশমহাবিদ্যা আর অন্য পার্শ্বে রয়েছে দশাবতার, যা মন্দিরের শোভা বর্ধনে সহায়তা করেছে। মন্দিরের ওপরের অংশেও যে সারিবদ্ধভাবে দশমহাবিদ্যাদের ফলকগুলি দেখা যায় এবং তার চারধারে যে উদ্ভিদ জগতের মোটিফ এবং জ্যামতিক নক্শার যে বিভিন্ন মোটিফ রয়েছে তাও মন্দিরের শোভা বর্ধনে সাহায্য করেছে। অনেক মন্দিরের পিলারের (থামের) গায়ে যে পৌরাণিক দেব-দেবীদের সঙ্গে দশমহাবিদ্যাদের দেখা যায় অথবা সমাজচিত্রের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন মহাবিদ্যাদের ভক্তরা পূজা করেছে। এই সমস্ত দৃশ্যও কিন্তুও মন্দিরের শোভা বর্ধন সহায়তা করেছে। আবার কোন কোন মন্দিরে এই মহাবিদ্যার ফলকগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা দেখে মনে হয় কোন মন্দিরের অভ্যন্তরেই এই মহাবিদ্যারা অবস্থান করেছে। যেখানে তাঁরা সিংহাসনের মধ্যে অধিষ্ঠান করে আছে। এখানেও সমকালীন শিল্পীরা সিংহাসন, সিংহাসনের নকশা, পিলার, পিলারের নক্শা প্রভৃতিকে নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন*(চিত্র নং-১০ ও ১১)*।

বাংলার বেশিরভাগ মন্দিরই আজ যথার্থ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দশমহাবিদ্যার অনেক ফলকও নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মহাবিদ্যাদের ফলকগুলি সাধারণত মন্দিরের দুই পার্শ্বে অথবা মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখ ভাগের ওপরের অংশে দেখা যায়। বেশিরভাগ ফলক প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক ফলক চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে এবং ভেঙ্গে

যাওয়ার ফলে কোন কোন মন্দিরে একসঙ্গে সব মহাবিদ্যাদের দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মন্দিরের ওপরের দিকের ফলকগুলি অনেক উঁচুতে থাকার ফলে ফলক চিহ্নতকরণেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

৫. দশমহাবিদ্যার কাহিনী ফলক ব্যবহারের প্রেক্ষিত: বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে আমরা নানা কাহিনিচিত্রের ফলক দেখতে পাই যেমন- পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি। এইসব কাহিনিচিত্রের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনিচিত্রের ফলকই বেশি মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দিরে। এইসব পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে রয়েছে রামায়ণের কাহিনির, মহাভারতের কাহিনির, কৃষ্ণলীলা, বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, নারায়ণ, জগন্নাথ, সরস্বতী বিশ্বকর্মা, দশমহাবিদ্যা, দশাবতার প্রভৃতি স্থান করে নিয়েছে।
এইসব মন্দিরগুলিতে এইসব পৌরাণিক দেব-দেবীদের ফলকগুলি অকারণে মন্দির গাত্রে চিত্রিত করা হয়নি। এইসব চিত্র ফলকগুলি ব্যবহারের কোন না কোন প্রেক্ষিত রয়েছে। বেশিরভাগ টেরাকোটা মন্দিরের সামনের অংশেই আমরা এই মহাবিদ্যাদের দেখতে পাই। এবার নিম্নে আমরা আলোচনা করবো বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্রের ফলক ব্যবহারের প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে:

প্রথমত: পুরাণ মতে দশমহাবিদ্যা থেকে দশাবতারের সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য বিভিন্ন স্থানের মন্দিরের সামনের অংশের দুই পার্শ্বে একদিকে দশমহাবিদ্যার ফলক থাকে এবং ওপর দিকে থাকে দশাবতারের ফলক।
দ্বিতীয়ত: পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য-ফলক অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে, আর এই পৌরাণিক দৃশ্যের ফলক চিত্রণ করতে গিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী ও পৌরাণিক কাহিনিচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্রের ফলকও চলে এসেছে।
তৃতীয়ত: আমরা জানি দশমহাবিদ্যা হল দেবী দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোন কোন মন্দিরে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রসঙ্গে অসুর নিধন, স্বপরবারে দেবী দুর্গার এইসব কাহিনিগুলির সঙ্গে দশমহাবিদ্যার কাহিনিটিও এসে পড়েছে।
চতুর্থত: আমরা জানি রামচন্দ্র ছিলেন দেবী দুর্গার একনিষ্ট ভক্ত এবং লঙ্কা যুদ্ধের পূর্বে ১০৮ টি নীল পদ্ম নিবেদন করে দেবীর অকাল বোধন করেছিলেন। বাংলার নানান স্থানের মন্দিরে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনিচিত্র সম্বলিত ফলকের সঙ্গে তাই আমরা এই দশমহাবিদ্যার দৃশ্য-ফলকও দেখতে পাই।
পঞ্চমত: বিভিন্ন স্থানের মন্দিরের চিত্র-ফলকে নানান পৌরাণিক ঘটনা ও দেব-দেবীদের সঙ্গে দশমহাবিদ্যাদের একত্রে দেখা না গেলেও কোন কোন মহাবিদ্যাকে দেখা যায় যেমন- কালী ছিন্নমস্তা, কমলা প্রভৃতি।
ষষ্ঠত্ব: 'নারী শক্তি'কে জাগ্রত ও পুনরুজ্জীবিত করতেও বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে মহাবিদ্যার প্রসঙ্গ এসেছে।
সপ্তমত: শাক্ত মতাবলম্বী মানুষদের কাছে এবং তন্ত্র সাধকদের কাছে এই মহাবিদ্যাদের স্ববিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই অনেক অঞ্চলের কালী ও দুর্গা মন্দিরের অলংকরণে এই দশমহাবিদ্যারা স্থান পেয়েছে।
অষ্টমত: অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠাকারী রাজা বা জমিদাররা শাক্ত ধর্মাবলম্বী হওয়ার দরুন তাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তারা এই দশমহাবিদ্যার ফলক প্রতিস্থাপন করান।
নবমত: প্রাচীন ভারতে যে শক্তি উপাসনার ধারা প্রচলিত, এর সূত্র ধরেই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে শক্তি উপাসনার মূল উৎস হিসাবে এই মহাবিদ্যাদের আগমন ঘটেছে।
দশমত: ভারতের মধ্যে বিশেষত পূর্ব ভারতে তন্ত্র সাধনার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি ছিল। আর এই তন্ত্র সাধনায় দশমহাবিদ্যা তো বিশেষভাবে গৃহীত। আর এই সূত্র ধরেই পূর্বভারতের বিভিন্ন সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতেও এই দশমহাবিদ্যাদের কাহিনী স্থান পেতে থাকে। সেই কারণেই বাংলার মন্দির টেরাকোটাতেও এই দশমহাবিদ্যারা অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে।
একাদশত: আমরা জানি মল্লরাজারা একসময় প্রচুর টেরাকোটার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মল্লরাজবংশ ছিল বৈষ্ণব ভাবধারায় সম্পৃক্ত। আর সেই জন্যই সেই সময় তন্ত্র সাধনা বা শক্তি সাধনা আপাতভাবে কিছুটা আড়ালে চলে যায়। কিন্তু এর কিছু কালপর নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজ্যে বসবাসকারী প্রজাদের নির্দেশ দেন

দীপান্বিতার দিন কালী পূজা করতে এবং কালী পূজা না করলে দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রচলন করেন। সেই সময় থেকে দীপান্বিতার দিন নদীয়ায় দশ সহস্র কালী পূজার প্রচলন হয়। আর এই বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল শাক্ত পদাবলীর অন্যতম রূপকার এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক রামপ্রসাদ সেন।[৬] আর এরই সূত্র ধরেই নদীয়া ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন টেরাকোটার দৃশ্য-ফলকের সঙ্গে এই দশমহাবিদ্যারাও স্থান করে নিয়েছে।

৬. উপসংহার:

ভারতবর্ষে শাক্ত ধর্মের উপাসনায় এবং তন্ত্র সাধনায় এই দশমহাবিদ্যারা নানাভাবে পূজিত হন। এই মহাবিদ্যারা আসলে হল দেবী দুর্গার দশটি রূপ। এই দশটি রূপকে দশভাবে দেখানো হয়েছে। কেউ বা ভয়ঙ্করী কেউ বা শুভঙ্করী, আবার কেউ ধন সম্পদ ঐশ্বর্যের দেবী আবার কেউ এই পৃথিবীর রক্ষা কর্ত্রী। বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতে এই দশহমাবিদ্যাদের কাহিনিচিত্র বারে বারে উঠে এসেছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এই দশমহাবিদ্যাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি বাস্তব সমাজজীবনেও এই মহাবিদ্যারা নারী শক্তিকে জাগরিত ও উজ্জীবিত করে। দশমহাবিদ্যার কাহিনিচিত্রের মাধ্যমে যে সমস্ত শক্তির আধার ব্যক্ত হয় তার উৎস হল এই 'নারী শক্তি'। নারী শক্তি হল এমন এক শক্তি যা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের সাধন করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত টেরাকোটার মন্দিরগুলিতে এই দশমহাবিদ্যাদের নানান সারিবদ্ধ প্যানেল বা একক ফলকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আমরা দেখতে পাই, যার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের মাতৃশক্তি আরাধনার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। সার্বিক বিচারে দেখা যায় টেরাকোটার মন্দির অলংকরণে দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্তি মোটিফ হিসাবে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দির নির্মাণের সময় টেরাকোটার ফলকে শিল্প-মোটিফ হিসাবে দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্তি সৃজনে শিল্পীরা তাঁদের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, শ্রীলা ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির: আখ্যান ও অলংকরণ*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ. নং-১৩০।

২. Newsletter Archives- www. Dollsofind.com, Viewed on 15.4.2016, 9.22 am.

৩. ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), *বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ)*, কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২, পৃ. নং-১৫৬।

৪. দ্রষ্টব্য ২ নং।

৫. দ্রষ্টব্য ২ নং।

৬. *স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নদীয়া*, নবদ্বীপ-পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পৃ: ১৯-২০।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

আহমেদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প (দ্বিতীয় সংস্করণ)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

কোঙার, গোপীকান্ত (সম্পাঃ), *বর্ধমান সমগ্র (৪র্থ খণ্ড)*, কলকাতা: দে বুক ষ্টোর, ২০০২।

ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড)*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।

ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), *বাংলার মন্দির শিলপ শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ)*, কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২।

ঘোষ, প্রদ্যৎ, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), *অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: ধর্মীয় ও পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস*, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২।

দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), *অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২।
দাশ, বিবেকানন্দ, *কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।
মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত*, কলকাতা: নটনম্‌কোলকাতা, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫।
মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, *বাজের বদলে রাজ*, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, *নানকার মলুটী*, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১২।
বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, *বাঁকুড়ার মন্দির*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৪।
বসু, শ্রীলা ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
রায়, প্রণব, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয*, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
ভট্টার্চায, শম্ভু, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির*, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।
চক্রবর্তী, রতনলাল, *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
হাসান, খন্দকার, মাহমুদুল, *প্রাচীন বাংলার প্রত্নকীর্তি*, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১২।
সান্যাল, হিতেশরঞ্জণ, *বাংলার মন্দির*, কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫
সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।
Bandyopadhyay, Sukhamay, *Temples of Birbhum*, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1984.
Chowdhury, Saifuddin, *Early Terracotta Figure of Bangladesh*, Dhaka: Bangla Academy, 2000.
Dasgupta, Prodosh, *Temple Terracotta of Bengal*, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
Deva, Krishna, *Temples of North India*, New Delhi: National Book Trust, 1986.
Dey, Mukul, *Birbhum Terracotta's*, New Delhi: Lalit Kala Academy, 1959.
George, Michell(ed.), *Brick Temples of Bengal*, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.
Mc Cutchion, David J, *Late Mediaeval Temples of Bengal*, Kolkata: The Asiatic Society, 1972.

ওয়েবসাইট:

- en.wikipedia.org/wiki/mahavidya Viewed on 3.3.2016
- www.srishivamandali.in Viewed on 3.3.2016
- www.shreemaa.org/story-of origindas-Mahavidyas/ Viewed on 15.3.2016
- temple-stories.blogspot.in/2015/08/dasa.mahavidya-adi-parasakhi-in-10.html Viewed on 20.4.2016
- creative.sulekha.com/dasa-mahavidya-in-terracotta-temples-of-bengal Viewed on 20.4.2016
- www.google.co.in Viewed on 20.4.2016
- amitabha gupta.wordpress.com Viewed on 20.42016
- Newsletter Archives-www.Dollsofind.com Viewed on 15.4.2016